নীরেন্দ্রনাথ : ব্যক্তিজীবন

মধুশ্রী সেন সান্যলা

নীরেন্দ্রনাথের সাহিত্যসৃষ্টিকে নিবিড়ভাবে জানতে হলে একবার ফিরে তাকাতে হয় তাঁর ব্যক্তিজীবনের তাৎপর্যময় ইতিবৃত্তের দিকে। তাঁর বিষয় ভাবনার বিপুল পটপ্রেক্ষার আনাচে-কানাচে প্রায়শই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে তাঁর ব্যক্তিজীবনের টুকরো ছবি।

অধুনা বাংলাদেশের ফরিদপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম চান্দ্রা। ১৯২৪ সালের ১৯শে অক্টোবর সেই গ্রামে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর জন্ম হয়। তাঁর পিতা জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী ছিলেন কলকাতায় বঙ্গবাসী কলেজের ইংরেজি সাহিত্যের অগ্রগণ্য অধ্যাপক। কবির মায়ের নাম প্রফুল্লনলিনী দেবী। তাঁদের আদি নিবাস যদিও বর্ধমান জেলার মানকরে, কিন্তু নীরেন্দ্রনাথের পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তী তাঁর কর্মজীবন কাটিয়েছেন কলকাতা শহরে। তবে দীর্ঘদিন কলকাতায় থাকলেও কলকাতার সঙ্গে বিশেষ অন্তরঙ্গতা গড়ে ওঠেনি তাঁর, তাই ষাট বছর পূর্ণ হওয়ার অনেক আগেই তিনি ফরিদপুরের সেই অনুন্নত গ্রামে জমি কিনে বসতবাড়ি নির্মাণ করেন এবং সেখানেই বাকি জীবন অতিবাহিত করেন।

নীরেন্দ্রনাথের শৈশব কেটেছে সেই গ্রামের সুস্নিগ্ধ নিসর্গের শ্যামল কোলে, পিতামহ-পিতামহীর কাছে জীবনের মৌলিক সত্যের পাঠ নিয়ে। গ্রামবাংলার বর্ণময় অভিজ্ঞতায় রঞ্জিত তাই তাঁর অনেক কবিতার ভাব-পরিমণ্ডল। ছেলেবেলার সেই স্মৃতিকথা আরো বিশদ বর্ণনা লাভ করেছে তাঁর হৃদয়স্পর্শী উপন্যাস 'পিতৃপুরুষ' এবং আত্মজৈবনিক রচনা 'নীরবিন্দু'-তে। তাঁর জীবনের শৈশব-কৈশোর অধ্যায়ের ব্যক্তিগত অনুভূতি - সমুজ্জল ঘটনাপঞ্জীর উল্লেখ পাওয়া যায় এইসব গ্রন্থে। কোনও ইতিহাস নয়, জীবনে বিম্বিত হতে থাকা আলোছায়াময় নানা তথ্যভারহীন ছবি এদের মূল উপজীব্য।

নীরেন্দ্রনাথের পিতামহ লোকনাথ চক্রবর্তী ছিলেন অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। প্রথাগত বিদ্যা ছাড়াও জীবনের ঘনিষ্টভাবে চেনা, জানা আর সেইসব অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে যে শিক্ষালাভ, ঠাকুরর্দা তাকেই বেশি গুরুত্ব দিতেন, তাঁদের গ্রামের বাড়িতে রাত তাড়াতাড়ি এসে হানা দিত। চারিদিকে অন্ধকার, কুকুরের ডাক, চৌকিদারের হাঁক, ঝড়ের রাতে তাঁদের দোতলা কাটের বাড়িতে টিনের চালে গাছের ডালের শব্দ— এইরকম ছমছমে পরিবেশে মাঝে-মাঝে ভীত হয়ে উঠত কবির শিশুচিত্ত। ঠাকুর্দা তখন নাতিকে এই বলে অভয় দিতেন যে রাতকে ভয় পাওয়া ভালো, রাতকে সকলে ভয় পায় বলেই সকালটা এত সুন্দর। তাঁর ব্যক্তিত্বের অন্তরালে যে স্নেহের ফল্গুধারার প্রবাহ ছিল তার সন্ধান পেতেন একমাত্র ঠাকুর্দার প্রিয় নাতিটি। তাঁর একান্ত ইচ্ছে ছিল যে নাতিটি তাঁর কাছেই মানুষ হোক, গ্রামের পাঠশালাতেই পড়াশোনা করুক। ছোট গ্রামে যেহেতু কোনও বিদ্যালয় নেই, তাই ভরসা একমাত্র পাঠশালাটি। কবির পিতামহী নিত্যসুন্দরী দেবী ছিলেন নর্মাল পাস মহিলা, কবিকে মুখে-মুখে ছড়া শেখাতেন, ভালো গল্প শোনাতেন। তিনি ঠাকুর্দাকে বারে-বারে পরামর্শ দিতেন নাতিকে পড়াশোনার জন্য কলকাতায় পাঠিয়ে দিতে তার বাবার কাছে। অথচ ঠাকুর্দার নিতান্ত অনাগ্রহ ছিল এই ব্যাপারে। খুব অল্প বয়সেই তাঁর নাতিটি যে গ্রামজীবনের বিভিন্ন বিষয়ে পারদর্শিতা অর্জন করতে সক্ষম হয়েছে সে বিষয়ে তিনি যথেষ্ট গৌরবান্বিত বোধ করতেন। এই প্রসঙ্গে একবার ঠাকুমাকে বলেছিলেন, ''দ্যাখো, ওর বয়স এখনও ছ'বছর পূর্ণ হয়নি। কিন্তু এখনই ও সাঁতার কাটতে পারে, গাছে উঠতে পারে, একটা টাকা দিয়ে হাটে পাঠালে জিনিসপত্র কিনে তারপর বাড়ি ফিরে বাকি - পয়সার হিসেব বুঝিয়ে দিতে পারে, কখন কোন ফসলের বীজ বুনতে হয় আর কখন কোন ফসল কেটে ঘরে তুলতে হয় তাও বোধহয় ও কারও চেয়ে কিছু কম জানে না, তার উপরে আবার শুভঙ্করের আর্যা আর খনার বচন যে মুখস্ত বলতে পারে, সে-কথা না হয় ছেড়েই দিচ্ছি। তা কলকাতার কোন ইস্কুল এই বয়সে এর চেয়ে ওকে বেশি শিখাতে পারত?''

বাবার প্রসঙ্গে নীরেন্দ্রনাথ আজও আপ্লুত হন। তাঁর ভাষায়, 'আমার বাবা ছিলেন খুব Colourful'—সেই বর্ণময় উপলব্ধির রেশ আজও যেন ছড়িয়ে আছে তাঁর জীবনের পরতে-পরতে। যদিও চাকরিসূত্রে কবির বাবা থাকতেন কলকাতায়, কিন্তু ছুটি হলেই চলে আসতেন গ্রামের বাড়িতে আর তখন সাড়া বাড়ি প্লাবিত হত আনন্দে-উচ্ছ্বাসে। কথায় কথায় গোটা বাড়িটাকে চমকে দিতে ভীষণ জোরে হেসে উঠতেন তিনি, ছেলেকে মজার-মজার সব গল্প শোনাতেন আর ডুব সাঁতারে পুকুর এপার-ওপার করতেন। তখন থেকেই কবি জানতেন যে তাঁর বাবা একজন মস্ত মানুষ, কলকাতার এক বিরাট বাড়িতে তাঁর পাঠশালা। বাবাকে সর্বক্ষণ কাছে পাওয়ার আকাঙ্ক্ষায় তাঁর শিশুচিত্ত ব্যাকুল হয়ে উঠত। একদিকে বাবা, অন্যদিকে ঠাকুর্দা, এই দুই ভিন্ন ব্যক্তিত্বের আকর্ষণে তিনি অনেকদিন পর্যন্ত বুঝেই উঠতে পারেননি যে কলকাতায় গেলে তাঁর বেশি ভালো লাগবে না এই পাড়াগাঁয়ের বাড়িতে।

তাঁদের গ্রামের বাড়িতে মায়ের সান্নিধ্য কমই পেয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ। তাঁর যখন মাত্র দু'বছর বয়স তখনই তার মাকে পাকাপাকিভাবে কলকাতায় চলে যেতে হয় ওখানকার সংসার সামলাতে। কবি রয়ে গেলেন ঠাকুর্দা ও ঠাকুমার কাছে। তবে তাঁর মায়ের টুকরো-টুকরো আলেখ্য ছড়িয়ে আছে 'নীরবিন্দু'-র নানা ভাঁজে। শৈশবেই তাঁর মায়ের মাতৃবিয়োগ হয়, মায়ের বাবা পুনরায় বিবাহ করেন। তাই কবির মা মানুষ হন তাঁর পিসির বাড়িতে। একটি ঘটনার মধ্যে দিয়ে আমরা জানতে পারি, নীরেন্দ্রনাথ তাঁর মায়ের কাছে একসময় গল্প শুনতে চাওয়ায় মা তাঁকে প্রচণ্ড ধমক দিয়ে বলেছিলেন যে তিনি কোনও গল্পই জানেন না। শৈশবে একথার অর্থ কবি সঠিকভাবে বুঝতে না পারলেও পরবর্তী সময়ে সেই স্মৃতি বয়সী হয়ে তাঁর সামনে তুলে দেবে যে মর্মান্তিক সত্যটা তা আর কিছুই নয়, মায়ের নিঃসঙ্গ মমতাহীন শৈশবের পটপ্রেক্ষা, ''তাঁর না ছিল ঠাকুমা, না ছিল মা। এক বছর বয়স থেকে মানুষ হয়েছিলেন পিসির কাছে। খুব একটা আদর-যত্নে যে মানুষ হয়েছিলেন এমন কথাও ভাবা শক্ত।...কিছুই আমি জানি না। শুধু মায়ের সেই ছেলেবেলার কথা যখন ভাবি, উশকো-খুশকো চুলের একটু-ভিতু কিন্তু ভীষণ - অভিমানী একটি শিশুর ছবি আমার চোখের সামনে ফুটে ওঠে।''[২]

গ্রামজীবনের খোলামেলা পরিবেশে নীরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছিলেন। গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হন, কিন্তু লেখাপড়া বিশেষ এগোয় না এই কারণে যে কঠিন শাস্তির ভয়ে পাঠশালায় যাওয়া তিনি ত্যাগ করেন। শেষ পর্যন্ত বাধ্য হয়েই

স্কুলে ভর্তি করার তাগিদে তাঁকে পঠিয়ে দেওয়া হয় কলকাতায়। এলেন কলকাতা শহরে, শিয়ালদা স্টেশনে চারিদিকে বড় বড় বাড়ি আর শান বাঁধানো চওড়া রাস্তা— এইসব নতুন দৃশ্য তাঁকে স্বভাবতই বিস্ময়-বিহ্বল করে তুলেছিল। কলকাতায় এসে ভর্তি হন বঙ্গবাসী স্কুলে। কিন্তু গ্রামের শিশুটির স্কুলের বন্ধ পরিবেশ একেবারেই ভালো লাগেনি, এমনকী কলকাতা শহরটাকে মোটেও পছন্দ হল না তাঁর। এই শহরের কঠিন কাঠামোয় বসে তাই তাঁর শিশুমন এই বাসনা লালন করত যে কীভাবে ফিরে যাওয়া যায় স্মৃতিমধুর গ্রামের শ্যামল মাটিতে, ঠাকুমার কোলের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে। কিন্তু সেই ফিরে যাওয়া আর হয়ে ওঠেনি তাঁর। যে শহরটাকে তিনি ভালোবাসতে চাননি, যেখান থেকে তিনি পালিয়ে যেতে চেয়েছিলেন, একসময়ে উপলব্ধি করলেন যে সেই শহরটার কাছেই তিনি ধরা দিয়েছেন। কলকাতার নাগরিক জীবনে এভাবেই ক্রমে তিনি অভ্যস্ত হয়ে উঠলেন। কবিরা দুই ভাই, দুই বোন। দিদি ছিলেন সকলের বড়, তাঁর সঙ্গেই তাই বন্ধুত্ব ছিল বেশি।

শৈশব থেকেই নীরেন্দ্রনাথের কবিতা লেখার ঝোঁক। প্রথম কবিতা কবে লিখেছেন তা যদিও তাঁর স্মরণে নেই, তবু সে যে অনেক ছেলেবেলায় তা অনুমান করতে অসুবিধে হয় না। আপনমনে কবিতা লিখে গেছেন, সমিল পদ্যে একের পর এক খাতা ভরে উঠেছে তাঁর। অথচ স্কুলজীবনে তিনি ছিলেন নেহাতই লাজুক ও অন্তর্মুখী। তিনি যে কবিতা লেখেন তা অনেকের কাছেই অজানা ছিল তখন। দুজন শিক্ষকের কথা কবি বিশেষভাবে স্মরণ করেন— কৃষ্ণদয়াল বসু এবং বৈদ্যনাথ মুখোপাধ্যায়। এঁদের কাছে তিনি একান্তই ঋণী। এভাবে লেখাপড়া ও তারই ফাঁকে কবিতাচর্চা করে কবি পৌঁছলেন স্কুলজীবনের শেষপ্রান্তে। বঙ্গবাসী ছাড়া মিত্র ইনস্ট্রিটিউশনেও কবি একবছর পড়াশোনা করেছেন। তবে ১৯৪০ সালে বঙ্গবাসী থেকেই তিনি ম্যাট্রিক পাশ করেন। ইন্টারমিডিয়েট পড়ার জন্য প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হলেও পারিবারিক কারণে তাঁকে গ্রামে ফিরে যেতে হয় এবং পরে ফরিদপুরের রাজেন্দ্র কলেজ থেকে ১৯৪২ সালে তিনি আই.এ.পাস করেন।

নীরেন্দ্রনাথের কবিতাচর্চার সূচনাপর্ব স্কুলজীবনে উন্মেষিত হলেও তাঁর অভিজ্ঞতার জগৎ পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্গত রবীন্দ্রপূর্ব, রবীন্দ্র-সমসাময়িক এবং রবীন্দ্রকাব্যের আবর্তনের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। তখনও তাঁর পরিচয় হয়নি আধুনিক কবিতার ভিন্নস্তরী আবহের সঙ্গে। কলেজে ছাত্রাবস্থাতে অপার বিস্ময়ের উপলব্ধি নিয়ে তাঁর সামনে ক্রমে খুলতে থাকে আধুনিক কবিতার এক-একটি অর্গল। পরিচিত হন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, প্রেমেন্দ্র মিত্রের অনন্যস্বাদ কবিতাকৃতির সঙ্গে। কিন্তু যে একটিমাত্র বই পড়ে তাঁর আশৈশব লালিত কবিতা-ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছিল সেই বইটির নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এই প্রসঙ্গে কবি বলেছেন, ''তখন আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্র। 'ধূসর পাণ্ডলিপি' সেই বয়সে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। আমার মনের মধ্যে একটা ওলট-পালট কান্ড ঘটে যায়, চোখের সামনে দৃশ্য জগতেরও রূপ একেবারে পালটে যেতে থাকে। বন্ধুরা কে কী বলে আমি বুঝতে পারি না। মিলফোর্ড সাহেব অনার্স ক্লাসে গ্রিসের ম্যাপ টাঙিয়ে পেলোপনিশিয়ার যুদ্ধের রণকৌশল বর্ণনা করেন, আমার কানে ঢোকে না। কলেজ ছুটির পরে, বাড়ি না-ফিরে, ভূতগ্রস্থের মতো আমি তখনকার সেই জনবিরল আমহার্স্ট স্ট্রিটের ফুটপাত ধরে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াই।''[৩] 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র কবিতা তাঁকে এতটাই আলোড়িত করেছিল যে তখন তাঁর চেতনার এক বিরাট অংশ জুড়ে ছিলেন জীবনানন্দ।

নীরেন্দ্রনাথের সাহিত্য - মানস গড়ে ওঠার পেছনে তাঁর বাবার অবদান অবশ্য স্বীকার্য। জিতেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী কলেজে শেক্সপিয়ার পড়াতেন আর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষাতত্ত্ব। তাঁর প্রধান চর্চার বিষয় ছিল শেক্সপিয়ারের ভাষা। তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে বাড়িতে ছিল বিদ্যাচর্চার উপযুক্ত পরিবেশ। ছেলেবেলাতেই বাংলার পাশাপাশি অনেক ইংরেজি বই পড়ার সুযোগ পেয়েছিলেন নীরেন্দ্রনাথ। ডিকেন্স, টেলস্ ফ্রম শেক্সপিয়ার, ট্রেজর আইল্যান্ড, গালিভার ট্র্যাভেলস্ ইত্যাদির কথা আজও স্মরণ করে তিনি! পরবর্তীকালেও বাবার সৌজন্যে পাওয়া ইংরেজি সাহিত্যের সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর বই তাঁকে বিভোর মগ্ন করে তুলত। এভাবেই ক্রমে গড়ে ওঠে ইংরেজি সাহিত্যের প্রতি তাঁর নিবিড় আকর্ষণ।

তবুও কলেজে নীরেন্দ্রনাথের ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়া হয়ে ওঠেনি এই কারণে যে তাঁর বাবার ধারণা ছিল খুব ভালো ইংরেজি শিখলেও যাদের মাতৃভাষা, সেই সাহেবদের মতো ইংরেজি ভারতীয়রা কখনই শিখতে পারবে না, তাই তার ছেয়ে অনেক ভালো অন্য কোনও বিষয় নিয়ে পড়াশোনা করা। অগত্যা বাবার পরামর্শ মেনে সেন্ট পলস্ কলেজে ইতিহাসে অনার্স নিয়ে ভর্তি হন নীরেন্দ্রনাথ। অবশ্য ভর্তি হওয়ার পর কলেজের পরিবেশ তাঁর বেশ ভালই লাগে। বিশেষত মিলফোর্ড সাহেবের উপস্থিতি কলেজটিকে নিঃসন্দেহে ধনবান করে তুলেছিল। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, নীরেন্দ্রনাথ তাঁর 'উলঙ্গ রাজা' কবিতাগ্রন্থটি উৎসর্গ করেছেন প্রশান্তকুমার বসু ও সি. এস. মিলফোর্ডকে; কারণ এই দই ব্যক্তিত্বের প্রতি কবি আজও অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি যখন প্রথমে বঙ্গবাসী কলেজে ভর্তি হন, তখন কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন প্রশান্তকুমার বসু। কিছুটা পিতৃ-পরিচয়ে, কিছুটা বা নিজগুণে কবি ছিলেন তাঁর স্নেহধন্য। সেন্ট পলস্ কলেজে কবিতাচর্চার পাশাপাশি যে অন্য একটি বিষয়ে কবির উৎসাহ ছিল তা হল খেলাধুলো। তাঁর বাবা ছিলেন মোহনবাগানের ফুটবলার খেলোয়াড়। কবি নিজেও ভালো ফুটবল খেলতেন এবং কলেজের নানা জায়গায় প্রতিনিধিত্ব করেছেন। ১৯৪৪ সালে এই কলেজ থেকে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এর পর ইচ্ছে হয় আইন পড়ার ভর্তি হন 'ল' কলেজে সেখান থেকে তিনি ইন্টারমিডিয়েট পাশ করেন।

নীরেন্দ্রনাথের চোদ্দ বছর বয়সে তাঁদের পরিবারে নেমে আসে এক চরম বিপর্যয়। হঠাৎ থ্রম্বোসিস রোগে আক্রান্ত হয়ে তাঁর বাবা একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েন। তিনি আরো দশ বছর বেঁচেছিলেন, কিন্তু কখনই আর স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারননি। যেহেতু কবি বাড়ির বড় ছেলে, তাই বাবার মৃত্যুর পর স্বভাবতই দায়িত্ব এসে পড়ে তাঁর ওপর। স্কলারশিপ পাওয়া সত্ত্বেও তাঁর আর এম.এ. পড়া হয়ে ওঠেনি। তবে তিনি অনেকদিন আগেই অনুভব করেছিলেন যে পড়াশোনার ফাঁকে-ফাঁকে সংসারের আর্থিক দায় তাঁকেও কিছুটা ভাগ করে নিতে হবে। তাই আই. এ. পাস করেই তিনি যুক্ত হন 'প্রত্যহ' নামে একটি দৈনিক পত্রিকার সঙ্গে আর এভাবে ওই অল্প বয়সে সাংবাদিকতায় তাঁর হাতেখড়ি হয়।

চল্লিশের দশক তখন নানা অভিঘাতে অস্থির। সেইসব নিদারুণ অভিজ্ঞতার মধ্যে দিয়ে পরিণত হয়েচে নীরেন্দ্রনাথের কবিসত্তা। উত্তাল অগ্নিগর্ভ কলকাতাকে তিনি সেসময় কীভাবে দেখেছিলেন তারই ধারাবাহিক স্মৃতিভাষ্য 'চল্লিশের দিনগুলি'।

এই দীর্ঘ কবিতাটিতে লিপিবদ্ধ হয়ে আছে আতঙ্কজনক বিভীষিকাময় পরিবেশের অনুপুঙ্খ বিবরণ। 'নীরবিন্দু'-র সমাপ্তিক পর্বেও এই দশকের আলোড়িত পটভূমির কিছুট উল্লেখ পাওয়া যায় : ''আসলে যে একটা আগ্নেয়গিরির উপরে আমরা দাঁড়িয়ে আছি, আর অগ্ন্যুদ্গারের সময়টা যে ক্রমেই এগিয়ে আসছে, এবার যে -কোন মুহূর্তে ঘটতে পারে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ, অন্তত সেই মুহূর্তে তা আমরা কেউ ঘুণাক্ষরেও জানতুম না। চল্লিশের গোটা দশকটাই আসলে একটার পর একটা বিস্ফোরণের দশক। এই শহরের চেহারা আর চরিত্রকে যা একেবারে আদ্যন্ত পালটে দিয়েছিল।''[৪]

পেশায় নীরেন্দ্রনাত সাংবাদিক। বি.এ. পাশ করার পর তিনি বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় কাজ করেছেন। 'মাতৃভূমি' ও 'অ্যাডভান্স' —এই দুটি কাগজে কাজ করার পর আবার কিছুদিনের জন্য ফিরে আসেন 'প্রত্যহ' পত্রিকায়, তারপর 'স্বরাজ', 'ভারত', 'নবযুগ', 'কিশোর', 'ইউনাইটেড প্রেস অফ্ ইন্ডিয়া', এবং 'সত্যযুগ' -এ সাংবাদিকতার পর নীরেন্দ্রনাথ ১৯৫১ সালে 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র সঙ্গে যুক্ত হন। ছোটদের পত্রিকা 'আনন্দমেলা' সম্পাদনা করেছেন তিনি বারো বছর। তাঁরই নিরলস প্রচেষ্টায় ও আন্তরিক প্রয়াসে পত্রিকাটি সাফল্যের শিখরে পৌঁছতে সমর্থন হয়েছে। তিনি মনে করেন সাংবাদিকতার এই পেশাই তাঁকে সুযোগ করে দিয়েছে মানুষ ও সমাজকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে প্রত্যক্ষ করার। সাংবাদিক জীবনে অনেক মানুষের কাছে কাজ শেখার সুযোগও পেয়েছেন কবি। এই প্রসঙ্গে 'ভারত' পত্রিকার নিউজ এডিটর অমূল্যচন্দ্র সেনের কথা তিনি আজও শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। 'পূর্বাশা'-র সম্পাদক এবং কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্যের কাছেও নীরেন্দ্রনাথ নানা কারণে ঋণী : ''শুধু সম্পাদকই তো তিনি ছিলেন না। তরুণ লেখকদের মস্ত একজন শুভার্থীও ছিলেন। খোঁজ রাখতেন, কার কী অবস্থা, কে কী করছে, কেউ অসুবিধেয় পড়ল কিনা। অসুবিধে যাতে কেটে যায়, তার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করতেন। তিনি যদি না সাহায্যের হাত বাড়াতেন, তা হলে আমরা অনেকেই হয়তো সহজে আবার উঠে দাঁড়াতেও পারতুম না।''[৫] কবিতায় আধুনিকতায় হাতেখড়ি যে তাঁর কাছেই, একথাও দ্বিধাহীনভাবে উচ্চারণ করেন কবি।

বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় নীরেন্দ্রনাথ কবিতা পাঠাতেন। 'দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম যে লেখাটি ছাপা হয় তা কিন্তু কবিতা নয়, একটি গল্প। এই পত্রিকায় তাঁর একটি কবিতা প্রকাশের ঘটনা বেশ উল্লেখনীয়। ১৯৪৫ সালে কলকাতায় এক বড় ছাত্র-মিছিলের ওপর পুলিশ গুলি চালায়। সেই গুলিতে নিহত হন রামেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় নামে ছাত্রসমাজের এক তরুণ কর্মী। নীরেন্দ্রনাথ তখন ল'কলেজের ছাত্র। পুলিশি হামলার এই ঘটনা তাঁর চোখের সামনেই ঘটে। ঘোরের মধ্যে বাড়ি ফিরে সেই রাতে তিনি লিখে ফেলেন একটি কবিতা— 'শহীদ রামেশ্বর'। পরদিন 'দেশ' পত্রিকায় সেটি পাঠিয়ে দেন। 'দেশ' -এর পরবর্তী সংখ্যায় পুরো একটি পাতা জুড়ে কবিতাটি ছাপা হয়। তরুণ সমাজের মুখে-মুখে তখন ছড়িয়ে পড়ে এই কবিতা।

নীরেন্দ্রনাথের প্রথম কবিতাগ্রন্থ 'নীলনির্জন' ১৯৫৪ সালে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়। এবারের তার নেপথ্যকাহিনীটি একটু শুনে নেওয়া যাক, ''একটু বেশি বয়সেই আমার প্রথম কবিতার বই বেরিয়েছে। কবিতা না লিখে পারি না।... এই সময় অরুণকুমার সরকার এসে বলল 'দিলীপ গুপ্ত মশাই তোমার কবিতার বই বের করতে চান। তোমার পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দাও।'...আমি তো সত্যি ভেবে পাণ্ডুলিপি তৈরি করে দিলুম দিলীপবাবুও খুশি হয়ে নিলেন, 'নীলনির্জন' বেরও করলেন। বের হওয়ার পর আমি বুঝতে পারলুম, আসলে দিলীপবাবু আমার কবিতা চাননি, তিনি চেয়েছেন অরুণকুমার সরকারের কবিতা।... আমি যখন গিয়ে অরুণকে বললুম, 'এ কী করলি', সে খুব মোক্ষম জবাব দিয়েছিল। সে বলেছিল, দ্যাখ ভাই, তোর জন্য যে আমি এত দৌড়ঝাঁপ করলুম, তার মানে এই নয় যে তুই আমার চেয়ে ভালো লেখা লিখিস। তা হলে কেন করলুম? আসলে কবিতা লেখাটা আমার কাছে শখের ব্যাপার।...কিন্তু তোর তো গোটা এক্সিসটেন্স নির্ভর করছে কবিতার ওপর। কবিতা না লিখলে তুই তো মারাই যাবি।'' ...আসলে আমরা একসঙ্গে জড়িয়ে-মনিয়ে ছিলুম।''[৬] বন্ধুত্বের এমন নজির তখন দুর্লভ ছিল না।

এরপর নীরেন্দ্রনাথ পাঠকসমাজকে একে একে উপহার দিলেন 'অন্ধকার বারান্দা' (১৯৬১), 'প্রথমনায়ক' (১৯৬১), 'নীরক্ত করবী' (১৯৬৫), 'নক্ষত্র জয়ের জন্য' (১৯৬৯) কবিতা সংকলন। তাঁর পরবর্তী বিখ্যাত কবিতাগ্রন্থ 'কলকাতার যীশু'১৯৬৯ সকালের সামনে সমানে তুলে ধরে এক নতুন কবিকে। এরপর ১৯৭৪ সালে তাঁর সর্বজনপ্রিয় 'উলঙ্গ রাজা' কাব্যগ্রন্থের জন্য তিনি 'সাহিত্য আকাদেমি' পুরস্কার পান। বইটি পাঠকসমাজে নিয়ে আসে এক তুমুল আলোড়ন। সাহিত্য আকাদেমির সৌজন্যে 'উলঙ্গ রাজা' গ্রন্থটি অনূদিত হয়েছে ইংরেজি ও বিভিন্ন প্রধান ভারতীয় ভাষায়।

মানবদরদী কবি সমকালীন সমাজের এক অন্যমাত্রিক ব্যাখ্যা তখন পেশ করতে চেয়েছেন 'বৃহত্তর পাঠকের দরবারে'। প্রকাশিত হয়েছে 'খোলা মুঠি' (১৯৭৪), 'কবিতার বদলে কবিতা' (১৯৭৬), 'আজ সলাকে' (১৯৭৮), 'পাগলা ঘন্টি' (১৯৮১), 'ঘরদুয়ার (১৯৮৩), 'সময় বড় কম' (১৯৮৪), 'রূপকাহিনী' (১৯৮৪), 'যাবতীয় ভালবাসাবাসি' (১৯৮৬), 'ঘুমিয়ে পড়ার আগে' (১৯৮৭), 'জঙ্গলে এক উন্মাদিনী' (১৯৮৯), 'আয় রঙ্গ (১৯৮৭) কবিতাগ্রন্থ। তাঁর 'চল্লিশের দিনগুলি' (১৯৯৪) বইটির সূচনাংশে দেখি চল্লিশের দশকের এক গনগনে ভাষ্যরূপ, কিন্তু সময়-ব্যবধানে রচিত গ্রন্থের পরবর্তী কবিতাগুলি প্রথম পর্বের তুলনায় অনেকটা শান্ত মেজাজের, অন্য চরিত্রের। এরপর 'সত্য সেলুকস' (১৯৯৫), 'সন্ধ্যারাতের কবিতা' (১৯৯৭), 'অন্য গোপাল' (১৯৯৯) 'জলের জেলখানা থেকে' (২০০০), 'সাকুল্যে তিনজন' (২০০০), কবিতা সংকলনে ক্রমে নতুন শতাব্দীতে পৌঁছে কবির দৃপ্ত ব্যঙ্গ পর্যবসিত হয়েছে যেন এক গভীর বেদানরোধে। বিবর্তনের পথ বেয়ে কবি এগিয়ে গেছেন 'কবি চেনে, সম্পূর্ণ চেনে না' (২০০১), 'দেখা হবে' (২০০২), 'ভালবাসা মন্দবাসা' (২০০৩), 'মায়াবী বন্ধন' (২০০৪), 'জ্যোৎস্নায় একেলা (২০০৬) থেকে 'অনন্ত গোধূলিবেলা' (২০০৮)-র সংবেদী মানসিকতার দিকে। তাঁর বিচিত্র ও সমৃদ্ধ সাহিত্য সৃষ্টির ধারা অব্যাহত আজও। কবিতা ভাবনার নব নব বাঁক, ছন্দ আঙ্গিক এবং শব্দ নির্বাচনের পালাবদল তাঁর লেখাকে ক্রমে এক স্বতন্ত্রধারায় উৎসারিত করেছে। তাঁর মোট প্রকাশিত কবিতাগ্রন্থ তিরিশটি। আঠারোটি ছড়ার বই লিখেছেন শিশুদের জন্য, যা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে যথাক্রমে দুটি 'ছড়া সমগ্র'-তে সংকলিত হয়েছে।

কবিতা যে তাঁর মাতৃভাষা এতো নীরেন্দ্রনাথের নিজস্ব স্বীকারোক্তি। গদ্য লেখার তাগিদ তিনি সচরাচর হয়তো অনুভব

করেন না, তবুও কবিতার পাশাপাশি তাঁর গদ্য অসম্ভব জনপ্রিয় ও প্রশংসিত। গদ্যের সভায় তাঁর ভূমিকা বস্তুতই সম্রাটের। তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'কবিতার ক্লাস' বিস্তর সাড়া ফেলেছিল পাঠকমহলে। ছন্দের মতো একটা কঠিন বিষয়কে এতটা উপভোগ্য করে তুলে ধরায় বইটির আবেদন আজও পাঠকের কাছে অপরিসীম। এরপর প্রকাশিত 'কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা', 'কবিতা কী ও কেন', 'সমাজ সংস্কার', 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা এবং অন্যান্য রচনা' ইত্যাদি গদ্য বইতে কোথাও কাব্যতত্ত্ব, কোথাও সাহিত্য প্রসঙ্গ ও তার মূল্যায়ন, কোথাও আবার স্মৃতিচারণ ও শ্রদ্ধার্পণ কিংবা প্রাত্যহিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে থাকা নতুন অনুষঙ্গ পরিবেশিত হয়েছে নিজস্ব মুন্সিয়ানায়। তাঁর একমাত্র উপন্যাস 'পিতৃপুরুষ' এবং আত্মজৈবনিক রচনা 'নীরবিন্দু' তাঁর গদ্যের ভান্ডারকে ক্রমে সমৃদ্ধ করেছে। ছোটদের জন্য দুটি উপন্যাসও লিখেছেন একসময়। এছাড়া নীরেন্দ্রনাথের অন্য স্বাদের গদ্যকৃতির মধ্যে রয়েছে চৌদ্দটি রহস্য উপন্যাস। 'বাংলা কী লিখবেন, কেন লিখবেন' তাঁর এক অনন্য কীর্তি। ২০১০-এর কলকাতা বইলোয় প্রকাশ পেয়েছে তাঁর 'আউটডোর' বইটির, যেখানে সত্যজিৎ রায়ের বিখ্যাত হিন্দী ছবি 'সতরঞ্জ কি খিলাড়ি'-র শুটিংয়ের অভিজ্ঞতা অত্যন্ত সাবলীল ও সপ্রতিভ স্টাইলে উপস্থাপিত হয়েছে।

নীরেন্দ্রনাথ ইংরেজি ও ফরাসি ভাষা থেকে বেশ কিছু কবিতা বাংলায় অনুবাদ করেছেন। ১৯৮৫ সালে তিনি প্যারিসে যান ভারত-উৎসবে আয়োজিত কবি সম্মেলনে যোগ দিতে। কর্মসূত্রে সেবার তাঁকে ব্রাসেল্‌স যেতে হয় এবং সেখানে বেলজিয়াম কবি মরিস কারেমের ফরাসি কবিতাকৃতির সঙ্গে পরিচিত হন ঘনিষ্ঠভাবে। মরিস কায়েম যে একান্ত রবীন্দ্রানুরাগী ছিলেন তাও প্রত্যক্ষ করেন তিনি কারেমের বাড়িতে সংরক্ষিত তাঁর লাইব্রেরিতে রবীন্দ্র রচনার ফরাসি অনুবাদ দেখে। এরপর ১৯৮৯ সালে বেলজিয়াম সরকার থেকে ছ'মাসের একটি স্কলারশিপের আমন্ত্রণে ব্রাসেল্‌সে গিয়ে মরিস কারেমের বেশ কিছু কবিতার তিনি বাংলা অনুবাদ করেন। তবে শুধু কবিতা নয়, অনেক ইংরেজি গদ্যেরও তিনি তর্জমা করেছেন, কখনও জীবিকার তাড়নায়, কখনও-বা আন্তর তাগিদে। তাদের মধ্যে উল্লেখনীয় 'অপুর পাঁচালি', যেখানে সত্যজিতের আন্তরিক ইচ্ছেকে শ্রদ্ধা জানিয়ে এবং শ্রীমতী বিজয়া রায়ের অনুরোধে নীরেন্দ্রনাথ সত্যজিতের ইংরেজিতে লেখা 'Apu's Trilogy'-র বাংলা অনুবাদ করেছেন তাঁর সাবলীল গদ্যে।

কর্মকৃতির জন্য অনেক সম্মাননা পেয়েছেন নীরেন্দ্রনাথ, পেয়েছেন বেশ কিছু পুরস্কার। ১৯৫৮ সালে 'উল্টোরথ পুরস্কার৪, ১৯৭২ সালে 'তারাশঙ্কর পুরস্কার', ১৯৭৪ সালে 'সাহিত্য আকাদেমি', ১৯৭৬ সালে 'আনন্দ পুরস্কার', ১৯৯৯ সলে 'স্বর্ণাঞ্চল পুরস্কার' এবং ২০০৬ সালে 'আনন্দশংকর পুরস্কার'। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমন্ত্রণে বিদ্যাসাগর লেকচারার হিসেবে ১৯৭৫ সালে প্রদত্ত বক্তৃতামালাই 'কবিতা কী ও কেন' নামে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০৭ সালের মে মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০০৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১০ সালের সেপ্টেম্বরে কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় কবিকে ডি. লিটউপাধিতে ভূষিত করে, যা তাঁর সৃজনকর্মকে সম্মানিত করে উত্তরিত করেছে নতুনতর মাত্রায়। কলকাতা পৌরসংস্থা থেকে ২০০৭-এর ২৩ জুন তাঁকে টাউন হলে নাগরিক সংবর্ধনা জানানো হয়।

ভ্রমণ নীরেন্দ্রনাথের একটি প্রিয় শখ, পৃথিবীর নানা প্রান্তে ঘুরেছেন তিনি। কখনও গেছেন কাজের প্রয়োজনে, কখনও-বা 'এক্সচেইঞ্জ ভিজিটার' হওয়ার আমন্ত্রণে। ১৯৫৮ সালে প্রথম ইউরোপে গিয়ে ব্রিটেন, প্যারিস, জুরিখ, রোম বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেন। ১৯৭১ সালে জার্মানি, ব্রিটেন হয়ে আমেরিকায় যান এবং সেখানকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যলয়ে কবিতা পাঠ ও কবিতা সাহিত্য নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। হাওয়াই, জাপান, হংকং হয়ে তারপর দেশে ফিরে আসেন। ১৯৮৫ সালে পুনরায় প্যারিস ও ১৯৮৮ সালে মস্কোতে যান ভারত উৎসবে যোগদানের উদ্দেশ্যে। ১৯৮৯ সালে ব্রাসেল্‌সে এবং ১৯৯০ সালে লিয়েজে বিশ্ব কবি-সম্মেলনে একমাত্র ভারতীয় প্রতিনিধি হিসেবে অংশগ্রহণ করেন। এরপরও বিদেশে গেছেন বহুবার। ২০০৬ সালে তাঁর সমগ্র জীবনের স্বীকৃতি হিসেবে টেক্সাসের হিউস্টন শহরে বিশ্ব বঙ্গ-সম্মেলনে তাঁকে 'লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড' দেওয়া হয়। কবি পরিভ্রমণের মধ্যে দিয়ে নিজের দেশেকেও দেখেছেন অনুপুঙ্খভাবে। পাহাড়ের চেয়ে সমুদ্র তাঁর অধিক প্রিয়। সাঁওতাল পরগণা ও ছোটনাগপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আজও তাঁর শৈশবস্মৃতিকে গভীরভাবে আলোড়িত করে, ''সেদিনের সেই পুঁচকে ছেলেটা এখন আর তত পুঁচকে নয়। কিন্তু ওই যে একটা নতুন জগতের মায়াঞ্জন তার চোখে সেদিন পরিয়ে দেওয়া হয়েছিল, তার গুণ আজও কাটল না। শরৎকাল এলেই সেই শালবন, সেই আকাশের গায়ে হেলান দেওয়া পাহাড়, সেই লাল কাঁকুরে রাস্তা আর সেই রোগা তিরতিরে নদীর কথা তাই আজও তার মনে পড়ে যায়। সেই জগতেই ফিরে যেতে যায় সে।''[৭]

নীরেন্দ্রনাথ যখন বি.এ. ক্লাসের ছাত্র। সেইসময় 'শ্রীহর্ষ' নামে একটি ইন্টারভার্সিটি স্টুডেন্টস জার্নাল প্রকাশিত হত। ছাত্রাবস্থায় এই পত্রিকার ইংরেজি সংস্করণের তিনি সম্প্রাদনা করেন দুবছর। এরপর ল-কলেজে পড়ার সময় বাংলা সংস্করণটিরও সম্পাদনার দায়িত্বভার দেওয়া হয় তাঁকে। পত্রিকাটির যুগ্ম সম্পাদিকা ছিলেন সুষমা দেবী। পরবর্তীকালে এঁকেই আমরা কবিপত্নী হিসেবে পেয়েছি। কলেজজীবনে মেধাবী ছাত্রী হওয়া সত্ত্বেও বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যোগদানের ফলে তাঁকে কিছুদিন কারারুদ্ধ থাকতে হয়, ফলে সেখান থেকেই তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। শিক্ষকতাকে তিনি পেশা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। কবির সাফল্যমণ্ডিত জীবনের মূলে কবিপত্নীর অসীম অবদানের কথা বিশেষভাবে উল্লেখনীয়। কবিকে তাঁর প্রার্থিত লক্ষ্যে পৌঁছতে তিনি যে নানাভাবে সাহায্য করেছেন ও প্রেরমা দিয়েছেন তা অবশ্যই স্মরণযোগ্য। নীরেন্দ্রনাথের তিন সন্তান —এক পুত্র, দুই কন্যা। তাঁর পুত্র ড. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তাঁর বড় কন্যা ড. সোনালি বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগে অধ্যাপনা করেন। কবির ছোট কন্যা ড. শিউলি সরকার বর্তমানে লেডি ব্রেবর্ন কলেজের অধ্যক্ষ।

নীরেন্দ্রনাথের প্রিয় কবি যে কৃত্তিবাস ও কাশীরাম, একথা প্রায়শই বলে থাকেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ আজও তাঁর কাছে কতটা প্রাসঙ্গিক সে বিষয়ে তিনি বলেন, ''প্রাসঙ্গিকতার কথায় বলি, যিনি যে বাড়ির মধ্যে আশ্রয় নিয়েছেন, সেই বাড়িটি তাঁর জীবনে যতটা প্রাসঙ্গিক। আমাদের জীবনে রবীন্দ্রনাথও প্রাসঙ্গিক ঠিক ততটাই। আশ্রয় হিসেবে তাঁকে যে আমরা

নির্বাচন করে নিয়েছি, তা অবশ্য নয়, আসলে এটা আমাদের পেয়ে যাওয়া আশ্রয়। জন্মসূত্রে পাওয়া। যে পরিমন্ডলে আমরা জন্মেছি, এবং যার মধ্যে কেটেছে আমাদের জীবন, আদ্যন্ত তা ছিল রবীন্দ্র-প্রভাবিত। প্রভাবের সেই বলয় থেকে বেরিয়ে আসতে পারতুম আমরা। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আর বেরিয়ে আসিনি। কেননা তারুণ্যের তাড়নায় বারকয়েক হাত পা ছুঁড়বার পরেই আমাদের এই বোধোদয় হয়েছিল যে বিদ্রোহের জন্য বিদ্রোহ কোনও কাজের কথা নয়...রবীন্দ্রনাথের ভিতর থেকেই আমরা সংগ্রহ করতে পারব আমাদের সংগ্রামের প্রেরণা। সেটাও আমরা বুঝতে পেরেছিলুম।"[৮] তবে রবীন্দ্রনাথের গল্প ও প্রবন্ধের অধিক ভক্ত কবি। এই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ''গীতাঞ্জলি থেকে আমার যাত্রারম্ভ মৃত্তিকার দিকে। ঈশ্বর নিয়ে আমি ভাবিত নই। আমি মানুষ নিয়ে ভাবিত।... রবীন্দ্র সাহিত্যের কোন্‌খানে এমন সাধারণ মানুষের সন্ধান পাওয়া যাবে? বলাবাহুল্য, তাঁর কথাসাহিত্যে।"[৯] তাই বোধহয় নীরেন্দ্রনাথের কবিতাতেও মানুষের ব্যক্তিরূপ এত বেশি প্রাধান্য পায়। তাঁর কবিতা ভাবনার মূলকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে থাকে সেই মানুষ যে চরম বিপর্যয়ের মধ্যেও তার জীবনযাপন নিয়ে, তার সমাজ সংসার নিয়ে, প্রেম-অপ্রেম নিয়ে, আনন্দ-বেদনা নিয়ে সপ্রশ্ন বিশ্বাসে সুস্থিত থাকতে পারে। কবির কাছে, 'মানবতার চাইতে মানুষের মাহাত্ম্য কিছু কম নয়।' শৈশব ও কৈশোর আহৃত কিছু সনাতন মূল্যবোধ আজও সযত্নে লালন করেন তিনি, তাদের বিচ্যুতি তাঁকে কষ্ট দেয়। যেহেতু কোনও রাজনৈতিক দলের কাছেই তিনি আত্মসমর্পণ করেননি কখনও, তাই তাঁর বলিষ্ঠ ঘোষণা 'আমার ভেতরে কোনও দল নেই।'

নীরেন্দ্রনাথের কথায় ও ব্যবহারে যে দৃঢ়তা ও আত্মপ্রত্যয় রয়েছে, তাঁর লেখায় যেন তারই প্রতিফলন পরিদৃষ্ট হয়। জীবনপ্রাচুর্যে পরিপূর্ণ, ঋজু, উন্নত চেহারার এই কবি শুধু ভালো লেখেনই না, একজন সুবক্তাও। তাঁর গভীর আবেদনশীল কণ্ঠস্বরে বিমুগ্ধ হন শ্রোতারা। এই বয়সেও ঈর্ষণীয় স্মৃতিশক্তি নিয়ে স্মৃতির কোঠা থেকে অক্লেশে নামিয়ে আনতে পারেন যে কোনও কবিতার পংক্তিমালা কিংবা গদ্যের কোনও প্রাসঙ্গিক অংশ। পশ্চিমবঙ্গ বাঙলা আকাদেমির সভাপতির পদে যোগ দেন নীরেন্দ্রনাথ ২০০৪ সালের ১লা জানুয়ারি। সেইসময় বাংলা বানানের প্রয়োগ ও সংস্কার নিয়ে অনেক কাজ করেছেন তিনি, নিজেকে নিয়েজিত রেখেছিলেন বাংলা শব্দ ব্যবহারের নতুন প্রায়োগিক পদ্ধতির গবেষণায়। ২০১১ সালে সভাপতির পদ থেকে স্বেচ্ছায় অবসর নেন তিনি শারীরিক অসুস্থতার কারণে।

দেশে-বিদেশে ভ্রমণের সুবাদে নীরেন্দ্রনাথ নিত্য প্রত্যক্ষ করেছেন নতুন পরিবেশ, সান্নিধ্যে এসেছেন নতুন মানুষের, সেইসব নানামাত্রিক অভিজ্ঞতা উপজীব্য হয়ে উঠেছে তাঁর সাহিত্য সৃষ্টিতে। প্রসঙ্গত একটি উদাহরণের সাহায্যে কবি বলেন যে, মূর্তি আসলে পাথরের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, একমাত্র ভাস্করের প্রচেষ্টায় সেই মূর্তি পাথর থেকে বেরিয়ে আসে; ঠিক সেইভাবেই কবিতাও চারপাশের উপকরণের মধ্যে থাকে, কবি সেখান থেকে কবিতাকে খুঁজে নেন। অত্যন্ত অভিজ্ঞতা-আশ্রয়ী কবি নীরেন্দ্রনাথ। অভিজ্ঞতায় জারিত হয়ে কীভাবে লেখেন তিনি, তা সরাসরি জ্ঞাপন করেছেন এইভাবে: ''কবিতা, কল্পনালতা'য় আমি বিশ্বাস করি না। যার সঙ্গে আমার সম্পর্ক স্থাপিত হয়নি, অর্থাৎ চোখ-কান-স্পর্শ কি ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের যোগাযোগ তৈরি হয়নি তাকে নিয়ে আমি লিখতে পারি না।"[১০]

ক্রমে আরও স্বগত, আরও আত্মমগ্ন হয়ে যাচ্ছে নীরেন্দ্রনাথের উচ্চারণ। তাঁর সাম্প্রতিক ভাষ্য যেন ছুঁয়ে যায় তাঁর প্রজ্ঞা জীবনবোধের এক-একটা ভিন্নস্বাদ বিভঙ্গকে। সাতাশি বছর বয়সেও নিরলস সৃষ্টি প্রাচুর্যে ডুবে থেকে আমাদের হাতে তুলে দিচ্ছেন এমনই সব নির্মাণ, যা বহুধাবিস্তৃত জীবনবীক্ষায় প্রসাধনহীন, জাঁকজমকহীন, প্রত্যয়ী শব্দবিন্যাসের অনবদ্য নজির, যন্ত্রণা ও মুক্তির আলেখ্য। বর্তমান বাসভবন বাঙ্গুর অ্যাভিনিউতে বসে নীরেন্দ্রনাথ এভাবেই তাঁর স্বাতন্ত্র্য মুদ্রিত রেখে চলেছেন 'নিজ হাতে নিজস্ব ভাষায়'।

উল্লেখসূত্র:

১। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৯৯৯, 'নীরবিন্দু', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ১৪

২। তবেদ, পৃ: ৯৬, ৯৭

৩। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৪০৮, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', (রবীন্দ্রনাথ ও আমরা এবং অন্যান্য রচনা), অরুণা প্রকাশনী (প্রথম প্রকাশ), পৃ: ৭৭

৪। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৯৯৯, 'নীরবিন্দু', দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ: ২৪২

৫। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৯৯২, 'সঞ্জয় ভট্টাচার্য', (কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা), পুনশ্চ (প্রথম প্রকাশ), পৃ: ১৫৮, ১৫৯

৬। সাক্ষাৎকার : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০০৬, পৃ: ১৪২, ১৪৩

৭। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, 'ছুটিতে কোথায়', (রবীন্দ্রনাথ ও আমরা এবং অন্যান্য রচনা), অরুণা প্রকাশনী (প্রথম প্রকাশ), পৃ: ১০৯

৮। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৪০৮ বঙ্গাব্দ, 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা', (রবীন্দ্রনাথ ও আমরা এবং অন্যান্য রচনা), অরুণা প্রকাশনী (প্রথম প্রকাশ), পৃ: ১২

৯। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, ১৯৯২, 'রবীন্দ্রনাথ ও আমরা' (কবিতার দিকে ও অন্যান্য রচনা) পুনশ্চ (প্রথম প্রকাশ), পৃ: ৭৮

১০। সাক্ষাৎকার : নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী, বইয়ের দেশ, এপ্রিল-জুন ২০০৬, পৃ: ১৪৩,১৪৪।